ছাত্রজীবনে চোখের দুর্দ্দশা।

অধ্যাপক শ্রীঅমুতোষ দাশগুপ্ত এম্,-এ.

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল। এই কমিটি ১৯২০ সালের ২৮শে মার্চ্চ কার্য্যারম্ভ করেন, এবং পরবর্ত্তী এপ্রিল মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাস এবং আরও কয়েকটী কলেজের ছাত্রদের স্বাস্থ্যের বিবরণ সাধারণের নিকট উপস্থিত করেন। ছাত্রদের স্বাস্থ্যের শোচনীয় অবস্থা জ্ঞাত হইয়া কলিকাতা রিভিউ দেশবাসীকে এই বিবরণ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া দেশের শিক্ষিত জীবন কিরূপ দ্রুতবেগে ধ্বংশের মুখে পতিত হইয়া নিশ্চয় বিনাশ প্রাপ্ত হইবে তাহাই ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিয়াছেন এবং পরিশেষে বলিয়াছেন, "If the health of the students thus progressively deteriorates, then the whole system of our education should either be overhauled or be entirely abolished. The sooner we do either, the better." অর্থাৎ যদি ছেলেদের স্বাস্থ্য এইভাবে ক্রমশঃ বিনষ্ট হইতে থাকে তবে আমাদের শিক্ষা প্রণালীর আমূল সংস্কার অথবা সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন হওয়াই আবশ্যক। এই দুইএর এক যত শীঘ্র করিতে পারি ততই মঙ্গল। আমরা রিপোর্ট খানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি; এবং বর্ত্তমানে উহার কিয়দংশ মাত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। রিপোর্টে প্রকাশ গত ১৯২২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মোট ৩৮০৪টী ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে শত করা ৩৬টী যুবকের চোখের অবস্থা সুস্থ নহে, কিন্তু এই ছত্রিশের মধ্যে কেবল মাত্র তেরটী যুবক চশমা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া শতকরা ৪১টী যুবকের মেরুদণ্ড বক্র। আমরা জার্ম্মনদেশের একটী তালিকায় দেখিয়াছি যে দশ হাজার পরীক্ষিত ছাত্রের মধ্যে ১৮০০ ছাত্রের অর্থাৎ শতকরা ১৮টী ছাত্রের চক্ষুর অবস্থা অসুস্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। গ্রাম্যবিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ১·৪টী বালক মায়োপিয়া (myopia) অর্থাৎ নিকট-দৃষ্টি দোষ পীড়িত। নগরবাসী ছাত্রদের মধ্যে উহাদের সংখ্যা শতকরা ১১·৪। শিক্ষার উচ্চতা হিসাবে, ঐ দেশে নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয়ে মাইওপিয়ার (myopia) সংখ্যা শতকরা ৬·৮; মধ্যবিদ্যালয়ে শতকরা ১০·৩; এবং উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে শতকরা ২৬·২। উচ্চবিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীতে অর্দ্ধেকেরও অধিক ছাত্র মাইওপিয়া (myopia) রোগগ্রস্থ।

বাস্তবিক বর্ত্তমান যুগে সকল দেশেই লেখাপড়ার বয়সে নানাকারণে বালক বালিকাদিগের চোখের ক্ষতি হইতেছে, এ বিষয়ে প্রমাণের আর অভাব নাই। যেরূপ বর্দ্ধিত হারে চশমা প্রতিবৎসর ব্যবহৃত হইতেছে তাহাতে শিক্ষার প্রসারতা সূচিত হইতেছে বটে, কিন্তু দিন দিন চশমা ব্যবহারকারী বা চক্ষু রোগীদের সংখ্যা যে বাড়িতেছে তাহাও সপ্রমাণ হইতেছে। আসল কথা এই যে, চক্ষু যে পরিমান খাটিতে পারে তাহা অপেক্ষা ও তাহাকে বেশী খাটান হয়। এবিষয়ে বর্ত্তমান যুগের বিশেষজ্ঞদিগের মতানুসরণ করিয়া কয়েকটি কথা লিখিতেছি।

জন্মিবার সময় সাধারণতঃ শিশুগণ দূরের বস্তু ভাল দেখিতে পায়। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহাদের দৃষ্টি স্বাভাবিক হইয়া আসে এবং ক্রমশঃ নিকটের বস্তু ভালরূপ দেখিতে অভ্যস্ত হয়। বর্ত্তমান সময়েও দেখিতে পাওয়া যায়, অসভ্যদের দৃষ্টিশক্তি শিশুর ন্যায়। তাহারা দূরের বস্তু এত স্পষ্ট দেখিতে পায় যে তাহাতে আশ্চর্য্য বোধ হয়। সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে রাশি রাশি পুস্তক মুদ্রিত ও পঠিত হইতেছে। তাহাতে চক্ষুর অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হইতেছে। লেখা পড়া, চিত্রাঙ্কণ, এবং যন্ত্রপাতিদ্বারা যে সমস্ত সূক্ষ্ম কার্য্য করা হইয়া থাকে তাহা ভাবিয়া দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে দূরের বস্তু অপেক্ষা নিকটের বস্তুর প্রতিই আমাদের অধিককাল মনোনিবেশ করিতে হয়। দৃষ্টিকে সম্মুখ হইতে দূরে, বা দূর হইতে সম্মুখে স্থাপন, এবং ঘুরান ফিরান পেশী দ্বারা সম্পন্ন হয়। বেশী হাঁটিলে পায়ের পেশী যেরূপ ক্লান্ত হয়, অতিরিক্ত পরিশ্রম দ্বারা অক্ষিপেশী ও তদ্রূপ ক্লান্ত হইয়া পড়ে। পাঠ্যাবস্থায় চক্ষুর অতিরিক্ত খাটুনী ভবিষ্যতে দৃষ্টিশক্তির পক্ষে অনিষ্টকর হইয়া থাকে।

চক্ষুর গঠন ও কার্য্য প্রণালীর আলোচনা এস্থলে অনাবশ্যক বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। মোটামুটী মনে রাখা দরকার, সুস্থ অবস্থায় চক্ষু গোলক প্রায় সগোল থাকে। ইহার পশ্চাদ্‌ভাগে যে রেটিনা অর্থাৎ স্নায়ু তন্তু থাকে বস্তুর প্রতিবিম্ব ঠিক তাহারই উপর পতিত হয়। চক্ষুর এই অবস্থাই স্বাভাবিক। চক্ষু গোলকটি বেশী চেপ্‌টা হইলে বস্তুর প্রতিবিম্ব রেটিনার পশ্চাতে চলিয়া যায়। এই প্রতিবিম্ব রেটিনার উপর আনিবার জন্য চক্ষু পেশী যথাসাধ্য চেষ্টা করে; এবং ইহা হইতে নানা যাতনার উৎপত্তি হয়। চক্ষু গোলকের এই চেপটা অবস্থার দোষ সারাইবার জন্য উন্নতপৃষ্ঠ চশমা ব্যবহৃত

হইয়া থাকে। ইহাতে বিনা আয়াসে বস্তুর প্রতিবিম্ব রেটিনার উপর আসিয়া পড়ে। চক্ষুগোলক সম্মুখ ও পশ্চাদ্দিকে ডিমের ন্যায় লম্বা হইলে বস্তুর প্রতিবিম্ব রেটিনার উপর না পড়িয়া সম্মুখে আসিয়া পড়ে। এই অবস্থায় নত পৃষ্ঠ চশমা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চক্ষুগোলক কিঞ্চিৎ চেপ্‌টা বা লম্বা হইলে তদ্দ্বারা সাধারণ কার্য্য করিতে কোন কষ্ট হয় না; কিন্তু লেখা পড়া বা সূক্ষ্ম কাজে চক্ষুকে খাটাইলে নানারূপ যন্ত্রণার উদ্রেক হইয়া থাকে।

মায়োপিয়া (লম্বাকৃতি চক্ষুগোলক-জনিত নিকটদৃষ্টি) বালক বালিকাদিগের মধ্যে বেশী। ক্রমাগত অধিকক্ষণ বসিয়া অপর্য্যাপ্ত আলোকে লেখা পড়া করিয়া দেহ ও মস্তিষ্ক ক্লান্ত করিলে এই অবস্থা সহজেই গুরুতর আকার ধারণ করে। বিদ্যালয়ের গৃহগুলিতে প্রচুর আলো থাকা দরকার। আলো কম হইলে পঠিতব্য বিষয় চক্ষুর অতিরিক্ত নিকটে রাখিতে হয়। ইহা চক্ষুর পক্ষে অপকারী। ঘরে প্রচুর আলোক থাকিলেও চলিবে না। তাহা এই ভাবে আসা চাই যেন পঠিতব্য পুস্তকের উপর ছায়া না পড়ে। বসিবার দোষেও ছায়া পড়িতে পারে। উপর হইতে আলো আসার বন্দোবস্ত থাকিলে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু একতালা বাড়ী বা শুধু উপর তলার ঘর ছাড়া এরূপ ব্যবস্থা সম্ভবপর নহে। স্কুল ঘরের জানালাগুলি খুব বড় এবং উপযুক্ত ভাবে অবস্থিত হইলেও চারি পার্শ্বে বড় বড় বাড়ী থাকিলে প্রচুর আলো আসিতে পারে না। আলো বাম দিক হইতে আসার বন্দোবস্ত থাকা ভাল। ডানদিক হইতে আলো আসিলে ডেস্কের উপর লিখিবার সময় ডান হাতের ছায়ায় উপর দৃষ্টি পতিত হইয়া থাকে। আলো সম্মুখ হইতে আসিলে সম্মুখের ছেলেরা উজ্জ্বল আলো পায়; পিছনের ছেলেরা কিছু আঁধারে থাকে। আলো বাম বা ডান দিক হইতে আসা ছেলেদের বসিবার উপর নির্ভর করে। শিক্ষকের বা কর্ত্তৃপক্ষের এদিকে দৃষ্টি থাকা কর্ত্তব্য। ঘরে এরূপ আলো থাকা উচিত যেন মেঘ বাদলেরদিনেও ঘরের সকল ছেলেই যথেষ্ট আলো পায়। যন্ত্রদ্বারা আলোর পরিমান নির্ণয় করা যাইতে পারে। অথবা যে সব ছেলে জানালা হইতে বেশী দূরে থাকে তাহারা ছাপার ক্ষুদ্রতম লেখা ৮ হইতে বারো ইঞ্চি দূরে রাখিয়া পড়িতে পারে কিনা দেখা কর্ত্তব্য। ইয়োরোপের অনেক বিদ্যালয়ে নির্দ্দিষ্ট আকারের অক্ষর (Snellen's 20 type) কুড়ি ফিট দূর হইতে পড়িতে না পারা গেলে কাজ বন্ধ করিয়া উঠিতে হয়।

স্কুলের বেঞ্চ ও ডেস্ক এবং ছেলেদের বসা সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক।

সোজা না হইয়া বসিলে মেরুদণ্ড বাঁকা হইয়া যায়। সাধারণতঃ পাঠ্যাবস্থায় মেরুদণ্ড এইরূপ দোষযুক্ত হইয়া থাকে। তাহাতে দৃষ্টি শক্তিও খারাপ হয়। বেঞ্চের পিছন দিকে ঠেস দেওয়ার বন্দোবস্ত থাকা ছেলেদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। সোজা হইয়া অধিকক্ষণ বসিয়া থাকা যায় না। পিঠের নীচের অংশ পর্য্যন্ত ঠেস দিতে পারিলেই হইল। মাথা পর্য্যন্ত ঠেস দিলে স্বাধীনভাবে নড়াচড়ার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে। ছেলেদের মধ্যে কেহ ছোট, কেহ বা ঢেঙ্গা হয়; সুতরাং সমান উচু বেঞ্চ ও ডেস্ক সকলের পক্ষে উপযোগী নহে। কোন কোন বাড়ীতে দেখিয়াছি ছেলেরা এত উঁচু টেবিলে পড়িয়া থাকে যে পুস্তক ও চোখের ব্যবধান মাত্র ৪।৫ ইঞ্চি। অভিভাবকদিগের অজ্ঞতা বা অনোযোগীতায় এইভাবে ছেলেদের চোখের সর্ব্বনাশ হয়। পুস্তকের উপর ঝুঁকিয়া পড়াও মেরুদণ্ড ও চক্ষুর পক্ষে অনিষ্টকর। বেঞ্চ উচু হইলে ছেলেরা পা ঝুলাইয়া বসে; ইহাতে সহজেই ক্লান্তি জন্মে। মেজ বা একখণ্ড কাঠের উপর পা ভর করার বন্দোবস্ত থাকা চাই। পড়িবার ডেস্কের ঢাল ২০ কুড়ি ডিগ্রি, এবং লিখিবার জন্য ৪০ চল্লিশ ডিগ্রি ঢাল হইলে ভাল হয়।

যে সকল কারণে মায়োপিয়া বা নিকট-দৃষ্টি হয়, বসিবার দোষ তাহাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। পাঠ্যপুস্তকের ছাপাগুলি বড় ও পরিষ্কার হওয়া দরকার। খারাপ কাগজে ঘন ঘন অস্পষ্ট ছাপা চক্ষুর পরম শত্রু। এদেশে শিশুদের অঙ্কের বহিগুলি অনেকস্থলে অতি কদর্য্য ভাবে ছাপা হয়।

কোন এক সুপ্রসিদ্ধ লেখকের শিশুপাঠ্য ভূগোল দেখিয়া বড় দুঃখিত হইয়াছি। দামে সস্তা বটে, কিন্তু অক্ষরগুলি নিতান্ত ছোট; কাগজও জঘন্য। ভাল মানচিত্র নাই, অথচ ইহাই শিক্ষাবিভাগের অনুমোদিত এবং বাংলার বহু স্কুলে পাঠ্য। পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন কালে ছাপার প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি থাকা বাঞ্ছনীয়। অভ্যাসের বশে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা দ্রুত পড়িয়া থাকি। প্রত্যেক অক্ষর ভাল করিয়া দেখিবার অবসর পাঠকের নাই। অতএব অক্ষরগুলি বড় ও স্পষ্ট না হইলে চোখের বড় কষ্ট হয়। গৃহে ও বিদ্যালয়ে শ্লেট পেন্সিলের ব্যবহার এখন কমিয়া গিয়াছে; সম্পূর্ণ উঠিয়া গেলেই ভাল হয়। সাদা কাগজে কাল লেখাগুলি যেরূপ সুস্পষ্ট, শ্লেটের উপর পেন্সিলের দাগ তেমন নহে। বিশেষতঃ শ্লেটখানি তৈলাক্তবৎ হইলে দাগগুলি আরও অস্পষ্ট হয়। ঐরূপ লেখা পড়িতে হইলে চক্ষুর অতি

নিকটে আনিতে হয়। হাতের লেখা সোজা ও বড় হওয়া উচিত। কিছুকাল পূর্ব্বে ইংরাজী ডানদিকে কাত করিয়া লেখার প্রথা ছিল। এইরূপে লেখার দরুণ শরীর একদিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। এখন বিদ্যালয়ে সোজা ভাবে লিখিবার প্রথা অবলম্বিত হইতেছে। সোজা হইয়া বসিয়া লিখিতে হইলে এরূপ লেখাই উপযোগী। লিখিবার সময় কাগজ চোখের ঠিক সম্মুখে থাকা চাই; তাহাতে সোজা হইয়া বসা চলে। লিখিবার সময় অনেকেই ডাইনে বা বামে কাগজখানা একটু ঘুরাইয়া রাখে; এবং মাথা এক দিকে হেলাইয়া অক্ষরগুলি বক্র ভাবে দেখে। ছেলেদের যাহাতে এরূপ অভ্যাস না হয় তৎপ্রতি শিক্ষক মহাশয়ের দৃষ্টি থাকা দরকার। এরূপ অভ্যাস মেরুদণ্ড ও চোখের পক্ষে নিতান্ত অপকারী। এক বিষয় অধিক কাল মনোযোগ করিয়া পড়িলে মস্তিষ্কের ক্লান্তি জন্মে। বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থায় পরিশ্রমের মাত্রা অতিরিক্ত বাড়িয়া গিয়াছে।

শিশুর মস্তিষ্ক এতটা পরিশ্রম সহিতে পারে না। ক্রমাগত ৪।৫ ঘণ্টা বসিয়া লেখা পড়া করা এই বয়সে নিতান্ত অপকারী। স্কুল ক্রমাগত ৪।৫ ঘণ্টা না বসিয়া দুই বেলা বসিলে মন্দ হয় না। অন্ততঃ ছেলেদিগকে ঘন ঘন বিশ্রামের অবকাশ দেওয়া ভাল, এবং স্কুলে নানারূপে বৈজ্ঞানিক তামাসা ও আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা থাকা উচিত। কোন কোন বালিকা-বিদ্যালয়ে সূচি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। তাহা ভালই; কিন্তু ছোট ছোট মেয়েদের উপর অতিরিক্ত সূক্ষ্ম কাজের ভার চাপান উচিত নহে। যাহারা কলিকাতার ন্যায় সহরে বাস করে তাহাদের দৃষ্টি চতুর্দ্দিকের বাড়ীঘর দ্বারা প্রায় সর্ব্বদাই রুদ্ধ থাকে। এমত অবস্থায় খোলা ময়দানে বা গৃহের ছাদে বেড়াইয়া দূরের বস্তু প্রত্যহ দেখা উচিত। ছেলে মেয়েদের চোখের অবস্থা, অনেক পিতামাতার জানা থাকে না; এবং শিক্ষক মহাশয়ও জানিবার প্রয়োজন বোধ করেন না। ছেলে হয়ত ভাল দেখিতে পায় না—ভাল দেখা কাহাকে বলে তাহাও জানে না; কাজেই স্কুলের কাজ ভাল করিতে পারে না। দূরে বসিয়া ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা পড়িতে পারে না। মাষ্টার মহাশয় মনে করিতে পারেন ছেলেটী নিতান্ত অলস ও বোকা, মাথায় কিছুই নাই। এজন্য প্রত্যহ তাহার নিগ্রহ, নির্য্যাতন ও অপমানের সীমা থাকে না। এই শ্রেণীর বালক বালিকা বিদ্যালয়ে দুর্লভ নহে। শিক্ষক মহাশয় যাহাকে অলস, ভীরু, মূর্খ ও অকর্ম্মণ্য মনে করিয়া তাচ্ছিল্য ও মারধর করিয়া থাকেন তাহার চক্ষু দোষযুক্ত কিনা একবার সেই অনুসন্ধান লইলে অনেক স্থলে দেখিতে পাইবেন যে চোখের অসুস্থতাই ছেলের ঐরূপ দুরবস্থার প্রধান কারণ। এমত স্থলে সত্বর তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।